এই অচল গাড়িটির ৪ বছরের তেল খরচ ১২ লাখ

ফাইল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৬০০ কোটি=৬০০ কোটি

স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য দাতাদের কাছ থেকে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা ঋণ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু একের পর এক প্রকল্প ব্যর্থ হচ্ছে। দুর্নীতি আর অনিয়মের কারণে আর্সেনিক, পুষ্টি, আইএসটি এবং এইডসসহ কয়েকটি প্রকল্পের নামে এ পর্যন্ত খরচ হওয়া প্রায় ৬০০ কোটি টাকার সুফল পাওয়া যায়নি... লিখেছেন বদরুল আলম নাবিল

কেস স্টাডি-১

এইচপিএসপি প্রকল্পের আওতায় এইডস্ প্রতিরোধের জন্য বিশ্বব্যাংক ৫২.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছিল। একই কাজের জন্য ইউএনডিপি ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতি বছর ১ লাখ ১৪ হাজার ইউএস ডলার করে সাহায্য দিচ্ছে। এসব মিলিয়ে এইডস নিয়ে কাজ করার জন্য দাতা সংস্থাগুলোর বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩২৫ কোটি টাকা। ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা জুন, ২০০৫-এ। প্রকল্প মেয়াদের ৩ বছর চলে গেলেও এ পর্যন্ত ৪টি বিলাসবহুল পাজেরো জিপ ক্রয়, নতুন একটি অফিস নিয়ে ডেকোরেশন করা এবং ৯ জন অফিস স্টাফ নিয়োগ ছাড়া আসল কাজ কিছুই হয়নি। মোট প্রকল্প বরাদ্দের ২ শতাংশও এ পর্যন্ত খরচ করতে পারেনি। কাজ দেখাতে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক তার বরাদ্দকৃত ঋণের অর্ধেক প্রত্যাহার করে

প্রফেসর মিজানুর রহমান
ডিজি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

নিয়েছে। অর্থ চলে যাচ্ছে দেখে এখন যেনতেনভাবে খরচ করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

গত ১৭ এপ্রিল ডাক্তারদের সংগঠন বিএমএ'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। জানা গেছে, এই সম্মেলন চলাকালে উপস্থিত ৩ হাজার চিকিৎসকের উদ্দেশে এইডস সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেয়া হয়। এরপর উপস্থিত চিকিৎসকদের কাছ থেকে কায়দা করে স্বাক্ষর নেয়া হয় যে তাদের এইডস বিস্তার রোধ এবং এইডস রোগীকে কিভাবে চিকিৎসা করা হবে তার ওপর ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এবং এ বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ৩৭ লাখ টাকা!

সম্প্রতি জেনেভায় হয়ে গেলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ২০ সদস্যের একটি লট বহর নিয়ে জেনেভায় যান জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের লাইন ডিরেক্টর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মিজানুর রহমান। এই বহরে বিএমএ'র কয়েকজন নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন। এই পুরো বহরের সকল খরচ বহন করা হয় এইডস প্রজেক্ট থেকে। এ বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা।

প্রথমত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সম্মেলনে যোগ দেয়ার খরচ বহন এইডস প্রজেক্ট থেকে কেন হবে? এ রকম কোনো খরচ তো প্রকল্পে ধরা ছিলো না।

অভিযোগ আছে, এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে খরচ দেখানো হয়েছে অনেক বেশি।

দেশের মানুষের আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থার ঋণ এবং সাহায্যের ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থ শেষ কিন্তু দেশের কিছু কিছু এলাকায় আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলে লাল দাগ দেয়া ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তবে ৫০০ কোটি টাকা কোথায় গেলো?

কেস স্টাডি-২

দেশের মানুষের আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থার ঋণ এবং সাহায্যের ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থ শেষ কিন্তু দেশের কিছু কিছু এলাকায় আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলে লাল দাগ দেয়া ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তবে ৫০০ কোটি টাকা কোথায় গেলো?

তেমনিভাবে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম নামে ৪ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে ২০০১ সালে। প্রকল্পটির জন্য বিশ্বব্যাংক, সিডা, নেদারল্যান্ড সরকারসহ কয়েকটি দাতা সংস্থা ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩০০ কোটি টাকা) ঋণ দিয়েছে। প্রকল্প শেষ হবে জুন ২০০৪-এ, সামনে ১ বছর বাকি। অর্থ অর্ধেকের বেশি ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু অর্জন কেউ খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। তবে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায়!

কেস স্টাডি-৩

চলমান এইচপিএসপি প্রোগ্রামের আওতায় ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ইনসার্ভিস ট্রেনিং (আইএসটি)-এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৭৬ কোটি ২৭ লাখ ৩১ হাজার টাকা। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ২৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা। বাকি অর্থ বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজ করতে না পারায় বিশ্বব্যাংক এ খাত থেকে বাকি অর্থ ফেরত নিয়ে গেছে। এ প্রকল্পে ব্যাপক লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চলতি মাসে এ প্রকল্পের আওতায় ২০২ ক্যাটাগরির লোকাল ট্রেনিং এবং ৭৯ ক্যাটাগরির ফরেন ট্রেনিং সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ ট্রেনিং শেষ করতে পারেনি এবং প্রায় অর্ধেক ট্রেনিং শুরুই করতে পারেনি। অথচ আইএসটি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মীর জালাল সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে দাবি করেছেন, তারা ৯২ শতাংশ ট্রেনিং সম্পন্ন করেছেন। হ্যাঁ, অর্থ খরচের দিক বিবেচনা করলে তার দাবি যথার্থ, কারণ ভান্ডারে মাত্র ২১ লাখ টাকা আছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে টাকা খরচের যে হিসাব তারা দাখিল করেছে তাতে ৬৭ লাখ ২৮ হাজার টাকার ঘাপলা ধরা পড়েছে। এই টাকা কোথায় কিভাবে খরচ হয়েছে তার হিসাব নেই।

আইএসটি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মীর জালাল ২০০০কে বলেছেন, 'বর্তমান মহাপরিচালক আইএসটি'র লাইন ডিরেক্টর হয়ে আসার পর কাজে গতি এসেছে। তাই ২১ দিনের বেসিক ইএসপি ট্রেনিং '৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ দুই অর্থবছরে যেখানে মাত্র ১৩ হাজার ফিল্ড সার্ভিস প্রোভাইডারকে দেয়া সম্ভব হয়েছিল, সেখানে গত ছয় মাসেই প্রায় ৪০ হাজার জনকে এই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।'

কিভাবে সম্ভব? অনুসন্ধানে জানা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রেনিং না দিয়েই স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী এবং অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে অথবা জাল করে বা স্বল্পমেয়াদি ট্রেনিং দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ট্রেনিং দেখিয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্তদের সংখ্যা কাগজ-কলমে বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ খাতে ৩ কোটি টাকা খরচ দেখানো হয়েছে গত ১ বছরে।

আইএসটি থেকে কোটি কোটি টাকা মহাপরিচালক এবং তার বাহিনী আত্মসাৎ করেছে- এই মর্মে একটি চিঠি অধিদপ্তরের কর্মচারীরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর অফিস, দুর্নীতি দমন ব্যুরোসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করেছিল। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়ালে এ বিষয়ে পোস্টারিং হয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সবই চলছে আগের মতো।

কেস স্টাডি-৪

আইএসটি প্রোগ্রামের অধীনে স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের

কর্মীদের বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। এই ট্রেনিংটি কো-অর্ডিনেশনের দায়িত্বে আছেন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার এটিএম মোস্তাক বকুল। তিনি কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের পুরো কাজটি করিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠজন পান্থপথে অবস্থিত গ্রামীণ কম্পিউটারকে দিয়ে। নানা রকম গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়ে কাগজ-কলমে দেখানো হয়েছে সহস্রাধিক জনকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কয়েকটি সূত্র দাবি করে, প্রকৃত ট্রেনিংপ্রাপ্তের সংখ্যা ৩০০-এর বেশি হবে না। এক কিস্তিতেই এ খাত থেকে ১৫ লাখ টাকা ভাগবাটোয়ারা হওয়ার খবর রটেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। এভাবে অন্যান্য ট্রেনিংগুলোতেও গোঁজামিলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আইএসটি ট্রেনিং থেকে বিশ্বব্যাংক অর্থ প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রাক্কালে গত এপ্রিল মাসে দেড় কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন মহাপরিচালক। সে টাকার খরচের হিসাবে গড়মিল ধরা পড়েছে মন্ত্রণালয়ের কাছে।

কেস স্টাডি-৫

প্রায় ৪ বছর আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি মাইক্রোবাস (নোয়াখালী ব-২৬৭৯) চলাচলের অনুপযোগী হওয়ায় বিআরটিএ বাতিল ঘোষণা করেছে। সেই থেকে মাইক্রোবাসটি অধিদপ্তরের গ্যারেজে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে ঠিকই কিন্তু এই গাড়ির নামে প্রতিদিন ২৫ লিটার করে তেল ইস্যু দেখিয়ে তা বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছেন অধিদপ্তরের পরিবহন কর্মকর্তা আহমেদ করিম। বিষয়টি মহাপরিচালকের সমর্থনেই হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাঁচ-ছয় জন ড্রাইভার। তারা জানায়, গত ৪ বছরে এই গাড়িটির মাধ্যমে অন্তত ১২ লাখ টাকার তেল আত্মসাৎ হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, অধিদপ্তরের ২৩টি গাড়ি আছে। এই গাড়িগুলোর প্রত্যেকটি থেকে মাসে পঞ্চাশ-ষাট লিটার তেল নিয়ে নেন পরিবহন কর্মকর্তা। এভাবে মাস শেষে ২৩টি গাড়ির তেল থেকে আয় হয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা।

পরিবহন কর্মকর্তা আহমেদ করিম অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করে ২০০০কে বলেছেন, 'তেল আগের চেয়ে ৫ লিটার করে কম দিচ্ছি বলে ড্রাইভাররা আমার ওপর ক্ষেপে আছে। গাড়িটি একেবারে পরিত্যক্ত নয়, মাঝে মাঝে নষ্ট হয়। আবার ঠিক করে চালানো হয়।' কিন্তু সরজমিনে গিয়ে দেখা গেছে গ্যারেজে গাড়িটি একেবারে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

মহাপরিচালকের জন্য ৪টি গাড়ি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং ড্রাইভারদের কাছ থেকে জানা গেছে, মহাপরিচালক নিজে অধিদপ্তরের ৪টি গাড়ি ব্যবহার করেন। এর মধ্যে একটি দিয়ে

মহাপরিচালক নিজে অধিদপ্তরের ৪টি গাড়ি ব্যবহার করেন। এর মধ্যে একটি দিয়ে রেখেছেন মেয়ের বাসায়। ১টি তার পরিবারে বাজার-সওদা করার জন্য। বাকি ২টি তিনি ব্যবহার করেন। ৪টি গাড়ির ড্রাইভার এবং তেল নেয়া হচ্ছে অধিদপ্তর থেকে

রেখেছেন মেয়ের বাসায়। ১টি তার পরিবারে বাজার-সওদা করার জন্য। বাকি ২টি তিনি ব্যবহার করেন। ৪টি গাড়ির ড্রাইভার এবং তেল নেয়া হচ্ছে অধিদপ্তর থেকে।

সম্প্রতি এইডস প্রজেক্টের ঋণের টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে ৪টি বিলাসবহুল পাজেরো জিপ। এর মধ্যে একটি তিনি নিজে ব্যবহার করছেন। এর থেকে একটি জিপ মন্ত্রীর দপ্তরে, একটি সচিবের দপ্তরে দিয়ে রেখেছেন। সবগুলো গাড়ির তেলই আসছে এইডস প্রজেক্টের টাকা থেকে।

মহাপরিচালকের ব্যবহৃত গাড়িগুলো হলো- এবন-২২ নিশান পেট্রোল, ঢাকা মেট্রো ঘ ১১-২৮২১ পেরাডো, ঢাকা মেট্রো ক ০৩-৭২৪৫ (কার) এবং নতুন পাজেরো জিপ।

শর্ত ভঙ্গ করে নিম্নমানের মেশিন ক্রয়

ন্যাশন্যাল কিডনি ইনস্টিটিউটসহ দেশের বিশেষায়িত হাসপাতালে জটিল রোগ চিকিৎসার জন্য এমআরআই মেশিন, জি ৩১৩-এ ৬টি টেবিল এবং কয়েকটি আইসিইউ বেড ক্রয় করা হয়। টেকনিক্যাল ব্যবহারকারীদের মতামত এমনকি টেন্ডারের শর্ত ভঙ্গ করে এই ক্রয় সম্পন্ন করা হয়। প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন ছাড়াই একটি ভারতীয় কোম্পানির নিম্নমানের যন্ত্রসামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কোম্পানির অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দাতা বিশ্বব্যাংক দরপত্র স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ডিজি হেলথের উৎসাহে তা স্থগিত করা হয়নি। এরপর বিশ্বব্যাংক এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত নিয়ে নেয়। তারপর সরকারি অর্থে যন্ত্রপাতিগুলো কেনা হয়। সরবরাহের পর দেখা গেল, যন্ত্রপাতি এবং বেডগুলো অতি সাধারণ মানের কিন্তু ক্রয় করা হয়েছে অতি উচ্চ মূল্যে। ফলে এতে সরকারের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বিদেশে ট্রেনিং

২০০২-০৩ অর্থবছরে বিদেশে ট্রেনিং বাবদ বরাদ্দ ছিল ২৪ কোটি ২১ লাখ ৯০

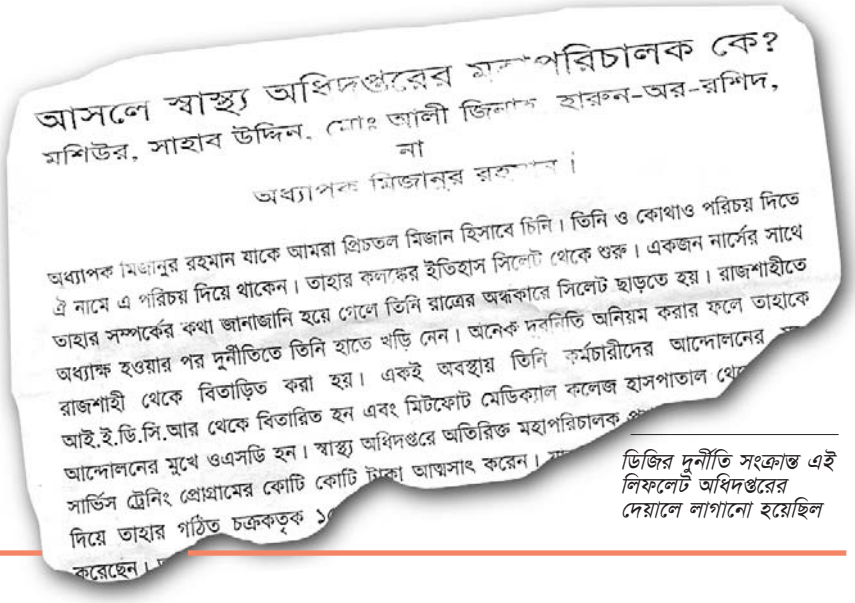

আসলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম..পরিচালক কে?
মশিউর, সাহাব উদ্দিন, মোঃ আলী জিন্নাহ, হারুন-অর-রশিদ,
না
অধ্যাপক মিজানুর রহমান।

অধ্যাপক মিজানুর রহমান যাকে আমরা প্রিচতল মিজান হিসাবে চিনি। তিনি ও কোথাও পরিচয় দিতে ঐ নামে এ পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাহার কলঙ্কের ইতিহাস সিলেট থেকে শুরু। একজন নার্সের সাথে তাহার সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়ে গেলে তিনি রাত্রের অন্ধকারে সিলেট ছাড়তে হয়। রাজশাহীতে অধ্যক্ষ হওয়ার পর দুর্নীতিতে তিনি হাতে খড়ি নেন। অনেক দুর্নীতি অনিয়ম করার ফলে তাহাকে রাজশাহী থেকে বিতাড়িত করা হয়। একই অবস্থায় তিনি কর্মচারীদের আন্দোলনের ... মিটফোর্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থে... আই.ই.ডি.সি.আর থেকে বিতারিত হন এবং ... আন্দোলনের মুখে ওএসডি হন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক ... সার্ভিস ট্রেনিং প্রোগ্রামের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। ... দিয়ে তাহার গঠিত চক্রকতৃক ... করেছেন।

ডিজির দুর্নীতি সংক্রান্ত এই লিফলেট অধিদপ্তরের দেয়ালে লাগানো হয়েছিল

হাজার টাকা। এর মধ্যে আইডিএ ঋণ ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭২ হাজার। এই বিষয়টি পরিচালনা করেন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাহফুজ কারদার।

কিছুদিন আগে ঢাকা মেডিকেলের ফরেনসিক বিভাগের মেডিকেল অফিসার মোস্তাক রহিম স্বপনকে পাকিস্তান এবং জাপানে পাঠানো হয় কমিউনিটি মেডিসিনের ওপর ট্রেনিংয়ের জন্য। ফরেনসিকের চিকিৎসক কমিউনিটি মেডিসিনের ট্রেনিংয়ের জন্য কেন? যেখানে কমিউনিটি মেডিসিনের অনেক ভালো প্রার্থী ছিল। তারপর মোস্তাক রহিম স্বপন বিএমএ করেন, এছাড়া চিকিৎসক হিসেবে তার আর কোনো সুনাম নেই। তবে দুর্নাম আছে। মাস দুয়েক আগেও ঢাকা মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীরা তার বিরুদ্ধে মিছিল করে বলেছে, সে মরা মানুষ বিক্রি করে খায়।

একই বছরে বিদেশে ট্রেনিংয়ের জন্য আরো পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. ফিরোজা এবং পরিচালক (পরিকল্পনা) ডা. আব্দুর রহমানকে। এ দু'জন যেহেতু কোনো হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজে কর্মরত নেই, তাই তাদের যে জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তা শুধু তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসেই কাজে লাগবে। সরকার কোনোভাবেই উপকৃত হবে না।

লেন-দেনের মাধ্যমে ট্রেনিংয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের কথা সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে।

৫ তলা সুবিশাল বাড়িটির বাইরের দিকটি এখনো রঙ করা হয়নি, কিন্তু ভেতরে সাজিয়েছেন মার্বেল পাথর এবং দামি টাইলস্ দিয়ে। মিজানুর রহমান চক্ষু চিকিৎসক, কিন্তু তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না। কয়েক বছর আগে যখন প্র্যাকটিস করতেন তখন তেমন রোগী আসতো না, তাই প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এই বিত্তবৈভবের উৎস কি?

মিস্টার টেন পার্সেন্ট

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাঁচ-ছয় জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ২০০০কে বলেছেন, মহাপরিচালক মিজানুর রহমান সকল প্রকল্প প্রোগ্রামের জন্য বরাদ্দ অর্থ থেকে ১০ শতাংশ অডিটের নাম করে নিয়ে থাকেন। এই অর্থ খামে ভরে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছুক একজন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ২০০০কে বলেছেন, সপ্তাহখানেক আগে তিনি ৩ লাখ টাকার কাজের ১০ শতাংশ ৩০ হাজার টাকা মহাপরিচালকের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে দিয়ে এসেছেন।

মোহাম্মদপুরের চাঁদ হাউজিংয়ের সি ব্লকের ৪১/সি বাড়িটি মিজানুর রহমানের (ডিজি হেলথ)। ৫ তলা সুবিশাল বাড়িটির বাইরের দিকটি এখনো রঙ করা হয়নি, কিন্তু ভেতরে সাজিয়েছেন মার্বেল পাথর এবং দামি টাইলস্ দিয়ে। মিজানুর রহমান চক্ষু চিকিৎসক, কিন্তু তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না। কয়েক বছর আগে যখন প্র্যাকটিস করতেন তখন তেমন রোগী আসতো না, তাই প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এই বিত্তবৈভবের উৎস কি? নামে-বেনামে তার আরো বিপুল সম্পত্তি আছে বলে জানা যায়। তাছাড়া তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সংসদ নির্বাচন করার। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তিনি এলাকায় যাচ্ছেন, খরচ করছেন। নিয়াজ নামে এক যুবককে দেখা যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। সে অধিদপ্তরের কর্মচারী নয় অথচ তাকে দিয়ে সরকারি বিভিন্ন গোপনীয় নথি বহন করাচ্ছেন মিজানুর রহমান। মাস শেষে নাকি ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়াজকে ৪ হাজার টাকা করে দেয়া হয়। নিয়াজকে জিজ্ঞেস করা হলে সে জানিয়েছে, মহাপরিচালক তার দাদা হন।

জানা গেছে, মিজানুর রহমান যেখানেই ছিলেন সেখানেই নতুন ইতিহাস তৈরি করে এসেছেন।

'৮০-র দশকে রাজশাহী মেডিকেলের অধ্যক্ষ ছিলেন। নানারকম দুর্নীতি এবং অনিয়ম করায় কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে তিনি রাজশাহী ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। এরপর আইডিসিআর পরিচালক হন। সেখানকার কর্মচারীরা দুর্নীতির অভিযোগে তাকে ৩ ঘন্টা তালাবদ্ধ করে আটকে রাখে। তারপর ২ সাপ্তাহ অফিসে যেতে পারেননি। এরপর মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নানারকম আর্থিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। যথারীতি কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতির অভিযোগে তখন তাকে ওএসডি করে। এই ওএসডি তার জন্য শাপে বর হয়ে ওঠে। বছরখানেক ওএসডি থাকার পর সরকার পরিবর্তন হলে তিনি নিজেকে বিএনপির লোক হিসেবে সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বিএনপি করার কারণেই তাকে ওএসডি করেছিল আওয়ামী লীগ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ম্যানেজ করে তিনি হয়ে যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক। এরপর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক। যদিও এর আগে তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগার হিসেবে প্রমাণ করেই প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদে ভিপি হয়েছিলেন ছাত্রলীগ থেকে।

শুধু আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনিয়ম নয়, তিনি অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেগে গিয়ে মাঝেমধ্যেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ করেছেন বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী। কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ভাষ্য, তিনি অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। অধিদপ্তরের বৃদ্ধ গাড়িচালক মফিজ মিয়ার ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে মহাপরিচালক তাকে শাস্তি হিসেবে খুলনার কয়রা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বদলি করেন।

স্বাস্থ্য অধিপ্তরের মহাপরিচালককে নিয়ে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সম্পর্কে তার বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছি। তার অফিসে কমপক্ষে ২০ বার ফোন করেছি। প্রতিবারই তার পিএ বলেছেন, স্যার মিটিংয়ে আছেন। সশরীরে তিনবার গিয়ে ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে কথা বলতে চাইলেও তিনি কথা বলেননি। মোবাইলে ফোন করা হলে তিনি তা কেটে দেন।

একটি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে শাস্তি না দিলে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প একের পর এক লোপাট হয়ে যাবে। জনগণের ঋণের বোঝা বাড়বে কিন্তু তা দেশ ও দশের কোনো কাজে আসবে না।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**